

হাইকোর্টে দেবকুমারবাবুর মামলা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি। শীতের প্রকোপ অল্পে অল্পে কমিতে আবৃত্ত করিয়াছে। মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস গায়ে লাগিয়া অদূর বসন্তের বাতী জানাইয়া দিলেও, সকালবেলায় সোনালী রৌদ্রটুকু এখনও বেশ মিঠা লাগে।

সেদিন সকালে আমি একাকী জানালার ধারে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে সংবাদপত্রের পাতা উল্টাইতে ছিলাম। ব্যোমকেশ প্রাতরাশ শেষ করিয়াই কি একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল; বলিয়া গিয়াছিল, ফিরিতে দশটা বাজবে।

খবরের কাগজে দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমার শেষ কিস্তির বিবরণ বাহির হইয়াছিল। কাগজে বিবরণ পড়িবার আমার কোনও দরকার ছিল না, কারণ আমি ও ব্যোমকেশ মোকদ্দমার সময় বরাবরই এজলাসে হাজির ছিলাম। তাই অলসভাবে কাগজের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ভাবিতেছিলাম—দেবকুমারবাবুর অসম্ভব জিদের কথা। তিনি একটু নরম হইলে হয়তো এতবড় খুনের মোকদ্দমা চাপা পড়িয়া যাইত; কারণ উচ্চ রাজনীতি পিনাল কোডের শাসন মানিয়া চলে না। কিন্তু সেই যে তিনি জিদ ধরিয়া বসিলেন আবিষ্কারের ফরমূলা কাহাকেও বলিবেন না—সে-জিদ হইতে কেহ তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। দেশলাই কাঠি বিশ্লেষণ করিয়াও বিষের মূল উপাদান ধরা গেল না। অগত্যা আইনের নাটিকা যথারীতি অভিনীত হইয়া এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অঙ্কে যবনিকা পড়িয়া গেল।

চিন্তা ও কাগজ পড়ার মধ্যে মনটা আনাগোনা করিতেছিল, এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। উঠিয়া গিয়া ফোন ধরিলাম। দারোগা বীরেনবাবু থানা হইতে ফোন করিতেছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বরে একটা উত্তেজিত বাগ্মতার আভাস পাইলাম।

‘ব্যোমকেশবাবু, আছেন?’

‘তিনি বেরিয়েছেন। কোনও জব্দরী দরকার কি?’

‘হাঁ—তিনি কখন ফিরবেন?’

‘দশটার সময়।’

‘আচ্ছা, আমিও দশটার সময় গিয়ে পৌঁছুব। একটা খারাপ খবর আছে।’

খবরটা কি জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই বীরেনবাবু ফোন কাটিয়া দিলেন।

ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। ঘড়িতে দেখিলাম বেলা ন’টা। মন ছুটফুট করিতে লাগিল, তব, সংবাদপত্রটা তুলিয়া যথাসম্ভব ধীরভাবে দশটা বাজার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না, সাড়ে ন’টার পরই ব্যোমকেশ ফিরিল। বীরেনবাবু ফোন করিয়াছেন শুনিয়া সচকিতভাবে বলিল, ‘তাই নাকি! আবার কি হল?’

আমি নীরবে মাথা নাড়িলাম। ব্যোমকেশ তখন পুঁটিরামকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিল; কারণ, বীরেনবাবুকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে চায়ের আয়োজন চাই; চা সম্বন্ধে তাঁহার এমন একটা অকুণ্ঠ উদারতা আছে যে তুচ্ছ সময় অসময়ের চিন্তা উহাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না।

চায়ের হুকুম দিয়া ব্যোমকেশ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া সিগারেট বাহির করিল; একটা সিগারেট ঠোঁটে ধরিয়া পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিতে করিতে বলিল, ‘বীরেনবাবু, যখন বলেছেন খারাপ খবর, তার মানে গুরুতর কিছূ। হয়তো—’

ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি মুখ তুলিয়া দেখিলাম সে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে হস্তহৃত দেশলায়ের বাগ্মটার দিকে তাকাইয়া আছে।

ব্যামকেশ মুখ হইতে অ-জ্ঞানিত সিগারেট নামাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, 'এ তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার দেখাছ! এ দেশলায়ের বাস্ক আমার পকেটে কোথা থেকে এল?'

'কোন দেশলায়ের বাস্ক?'

ব্যামকেশ বাস্কটা আমার দিকে ফিরাইল। দেখিয়া কিছু বুদ্ধিতে পারিলাম না সাধারণ দেশলায়ের বাস্ক যেমন হইয়া থাকে উহাও তেমন, কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া আছি দেখিয়া ব্যামকেশ পূর্ববৎ ধীরস্বরে বলিল 'দেখতে পাচ্ছ বোধহয়, বাস্কটার ওপর যে লেবেল মারা আছে তাতে একজন সত্যগ্রহী কুড়ুল কাঁধে করে তালগাছ কাটতে যাচ্ছে। অথচ আমাদের বাসায়—'

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, 'বুকেছি, ঘোড়া মার্কী ছাড়া অন্য দেশলাই আসে না।'

'ঠিক। সুতরাং আমি যখন বেরিয়েছিলুম তখন আমার পকেটে স্বভাবতই ঘোড়া মার্কী দেশলাই ছিল। ফিরে এসে দেখাছি সেটা সত্যগ্রহীতে পরিণত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আজকালকার এই স্বরাজ-সাধনার যুগেও এতটা পরিবর্তন সম্ভব হয় কি করে?' তারপর গলা চড়াইয়া ডাকিল, 'পুঁটিরাম!'

পুঁটিরাম আসিল।

'এবার বাজার থেকে কোন মার্কী দেশলাই এনেছ?'

'আজ্ঞে, ঘোড়া মার্কী।'

'কত এনেছ?'

'আজ্ঞে, এক বাণ্ডল।'

'সত্যগ্রহী মার্কী আনোন?'

'আজ্ঞে, না।'

'বেশ, যাও।'

পুঁটিরাম প্রস্থান করিল।

ব্যামকেশ শ্রু কুণ্ঠিত করিয়া দেশলায়ের বাস্কটার দিকে তাকাইয়া রহিল; ভাবিতে ভাবিতে বলিল, 'মনে পড়ছে, ট্রামে যেতে যেতে সিগারেট ধরিয়েছিলুম, তখন পাশের ভদ্রলোক দেশলাইটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তিনি সিগারেট ধরিয়ে সেটা ফেরৎ দিলেন, আমি না দেখেই পকেটে ফেললুম;—অজিত!'

'কি?'

উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, 'অজিত, সেই লোকটাই দেশলায়ের বাস্ক বদলে নিয়েছে।' দেখিলাম, তাহার মুখ হঠাৎ কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'লোকটা কে? তার চেহারা মনে আছে?'

ব্যামকেশ মাথা নাড়িল, 'না, ভাল করে দেখিনি। যতদূর মনে পড়ছে মাথায় মণ্ডিক্যাপ ছিল, আর চোখে কালো চশমা—' ব্যামকেশ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, 'বীরেনবাবু, কখন আসবেন বলেছেন?'

'দশটায়।'

'তাহলে তিনি এলেন বলে। অজিত, বীরেনবাবু, আজ কেন আসছেন জানো?'

'না—কেন?'

'আমার মনে হয়—আমার সন্দেহ হয়—'

এই সময় সিঁড়িতে বীরেনবাবুর ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, ব্যামকেশ কথাটা শেষ করিল না।

বীরেনবাবু আসিয়া গম্ভীর মুখে উপবেশন করিলেন। ব্যামকেশ তাঁহাকে সিগারেট দিয়া বলিল, 'নিজের দেশলাই দিয়ে ধরান। দেবকুমারবাবুর দেশলায়ের বাস্ক কবে চুরি গেল?'

'পরশু—' বলিয়াই বীরেনবাবু বিস্ময়িত নৈত্রে চাহিলেন—'আপনি জানলেন কোথেকে? একথা তো চাপা আছে, বাইরে বেরুতে দেওয়া হয়নি।'

‘স্বয়ং চোর আমাকে খবর পাঠিয়েছে’—বলিয়া ব্যোমকেশ ট্রোমে দেশলাই বদলের ব্যাপারটা বিবৃত করিল।

বীরেনবাবু গভীর মনোযোগ দিয়া শুনিলেন, তারপর দেশলায়ের বাজ্ঞটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়া বলিলেন, ‘এর মধ্যে একটি মারাত্মক কাণ্ড আছে—বাপু! লোকটা কে আপনার কিছুর সন্দেহ হয় না?’

‘না। তবে যেই হোক, আমাকে যে মারতে চায়, তাতে সন্দেহ নেই।’

‘কিন্তু কেন? এত লোক থাকতে আপনাকেই বা মারতে চাইবে কেন?’

আমি বলিলাম, ‘হয়তো সে মনে করে, ব্যোমকেশকে মারতে পারলে তাকে ধরা কঠিন হবে তাই আগেভাগেই ব্যোমকেশকে সরাতে চায়।’

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িল—‘আমার তা মনে হয় না। পুুলিসের অসংখ্য কর্মচারী রয়েছেন যারা বুদ্ধিতে কর্মদক্ষতায় আমার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বীরেনবাবুর কথাই ধর না। চোরের যদি সেই উদ্দেশ্যই থাকত তাহলে সে আমাকে না মেরে বীরেনবাবুকে মারবার চেষ্টা করত।’

প্রশংসাটা কিছু মারাত্মক জাতীয় হইলেও দেখিলাম বীরেনবাবু মনে মনে খুশী হইয়াছেন। তিনি বলিলেন, ‘না—না—তবে—অন্য কি কারণ থাকতে পারে?’

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ‘সেইটেই ঠিক ধরতে পারাছি না। যতদূর মনে পড়ছে আমার ব্যক্তিগত শত্রু কেউ নেই।’

বীরেনবাবু ঈষৎ বিস্মিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন, ‘বলেন কি মশায়! আপনি এতদিন ধরে চোর-ছাচড় বদ্মায়েসের পিছনে লেগে আছেন, আর আপনার শত্রু নেই! আমাদের পেশাই তো শত্রু তৈরী করা।’

এই সময় পুুলিটরাম চা লইয়া আসিল। একটা পেয়লা বীরেনবাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া ব্যোমকেশ মৃদুহাস্যে বলিল, ‘তা বটে। কিন্তু আমার অধিকাংশ শত্রুই বেঁচে নেই। যাহোক, এবার বলুন তো কি করে জিনিসটা চুরি গেল?’

বীরেনবাবু চায়ে এক চুমুক দিয়া বলিলেন, ‘ঠিক কি করে চুরি গেল তা বলা কঠিন। আপনি তো জানেন দেশলায়ের বাজ্ঞটা দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমায় একুর্জিনিট ছিল, কাজেই সেটা পুুলিসের তত্ত্বাবধান থেকে কোর্টের এলাকায় গিয়ে পড়িছিল। পরশু মোকদ্দমা শেষ হয়েছে, তারপর থেকে আর সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।’

‘তারপর?’

‘তারপর আর কি! সন্দেহের ওপর কয়েকজন আর্দালি আর নিম্নতন কর্মচারীকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, আর কিছু হচ্ছে না। এই নিয়ে ভেতরে ভেতরে মহা হৈচৈ পড়ে গেছে, খোদ গভর্নমেন্টের পর্যন্ত টনক নড়েছে। এখন আপনি একমাত্র ভরসা!’

‘আমাকে কি করতে হবে?’

‘খাস ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থেকে হুকুম এসেছে, চোর ধরা পড়ুক বা না পড়ুক, দেশলায়ের বাজ্ঞ উদ্ধার করা চাই। এর ওপর নাকি আন্তর্জাতিক শান্তি নির্ভর করছে।’

‘বুদ্ধলুম। কিন্তু আমাকে যে আপনি এ কাজে ডাকছেন—এতে কর্তৃপক্ষের মত আছে কি?’

‘আছে। আপনাকে তাহলে সব কথা বলি। দেশলায়ের বাজ্ঞ লোপাট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেসটা সি আই ডি পুুলিসের হাতে যায়। কিন্তু আজ তিন দিন ধরে অনুসন্ধান করেও তারা কোনও হাঁদিস বার করতে পারেনি। এদিকে প্রত্যহ তিন চার বার গভর্নমেন্টের কড়া তাগাদা আসছে। তাই শেষ পর্যন্ত বড়সাহেব আপনার সাহায্য তলব করেছেন। তাঁর বিশ্বাস এ ব্যাপারের সমাধান যদি কেউ করতে পারে তো সে আপনি।’

ব্যোমকেশ উঠিয়া একবার ঘরময় পায়চারি করিল, তারপর বলিল, ‘তাহলে আর কোনও কথা নেই। কিন্তু—আমি একবার কর্মশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।’

‘আপনি যখন যাবেন তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।’

‘বেশ—’ একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘আজ্ঞা আর নয়, কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আজকের দিনটা আমাকে ভাবতে দিতে হবে।’

বীরেনবাবু বলিলেন, ‘কিন্তু যতই দেরী হবে—’

‘সে আমি বুঝেছি, কিন্তু তাড়াতাড়ি যাহোক একটা কিছু করলেই তো হবে না। একটা অজানা অচেনা লোককে ধরতে হবে, অথচ এমন সূত্র কোথাও নেই যা ধরে তার কাছে পৌঁছতে পারা যায়। একটু বিবেচনা করে পন্থা স্থির করতে হবে না?’

‘তা বটে—’

‘ইতিমধ্যে যে লোকগুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে যদি কোনও স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেন তার চেষ্টা করুন। যদি—’

বীরেনবাবু গম্ভীর মুখে একটু হাসিলেন—‘তিন দিন ধরে অনবরত সে চেষ্টা হচ্ছে, কোনো ফল হয়নি। আপনি যদি চেষ্টা করে দেখতে চান, দেখতে পারেন।’

ব্যোমকেশ বিরসস্বরে বলিল, ‘পুলিসের চেষ্টা যখন বিফল হয়েছে তখন আমি কিছু করতে পারব মনে হয় না। তারা হয়তো নির্দোষ। যাক, তাহলে ঐ কথা রইল, কাল আমি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব; তারপর যাহোক একটা কিছু করা যাবে। এ ব্যাপারে আমার নিজের যথেষ্ট স্বার্থ রয়েছে, কারণ চোর মহাশয় প্রথমে আমার ওপরেই কৃপা-দৃষ্টিপাত করেছেন।’

অতঃপর আরো কিছুক্ষণ বসিয়া বীরেনবাবু গারোথান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া দেশলায়ের বাজটা নিজের লাইব্রেরী ঘরে রাখিয়া আসিল। তারপর পিছনে হাত রাখিয়া গম্ভীর ভ্রুকুণ্ডিত মুখে ঘরে পায়চারি করতে লাগিল।

এগারোটা বাজিয়া গেলে পুটুরাম আসিয়া স্নানের তাগাদা দিয়া গেল, কিন্তু তাহার কথা ব্যোমকেশের কানে পৌঁছিল না। সে অনামনস্কভাবে একটা ‘হুঁ’ দিয়া পূর্ববৎ ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

এই সময় ডাকপিওন আসিল। একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, ‘দেখুন তা এটা আপনার চিঠি কি না।’

ব্যোমকেশ খামের শিরোনামা দেখিয়া বলিল, ‘হ্যাঁ, আমারই। কেন বল দেখি?’

পিওন কাহিল, ‘নীচের মেসে এক ভদ্রলোক বলছিলেন এটা তাঁর চিঠি।’

‘সে কি! ব্যোমকেশ বক্সী আরো আছে নাকি?’

‘তিনি বললেন, তাঁর নাম ব্যোমকেশ বোস।’

ব্যোমকেশ চিঠিখানা আরো ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, ‘ও—তা হতেও পারে বাগবাজারের মোহর দেখাছ—কলকাতা থেকেই চিঠি আসছে। কিন্তু আমাকে কলকাতা থেকে খামে চিঠি কে লিখবে? যাহোক, খুলে দেখলেই বোঝা যাবে। যদি আমার না হয়—কিন্তু নীচের মেসে ব্যোমকেশ নামে আর একজন আছেন এ খবর তো জানতুম না।’

পিওন প্রস্থান করিল। ব্যোমকেশ কাগজ-কাটা ছুরি দিয়া খাম কাটিয়া চিঠি বাহির করিল, তাহার উপর চোখ বুলাইয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, ‘আমার নয়। কোকনদ গুপ্ত—অশ্ভুত নাম—কখনও শুনেনি বলে মনে হয় না।’

চিঠিতে লেখা ছিল—

সম্মান পুরস্কার নিবেদন,

ব্যোমকেশবাবু, অনেকদিন আপনার সহিত দেখা হয় নাই, কিন্তু তবু আপনার কথা ভুলিতে পারি নাই। আবার সাক্ষাতের জন্য উন্মুখ হইয়া আছি। চিন্তিতে পারিবেন তো? কি জানি, অনেকদিন পরে দেখা, হয়তো অধমকে না চিন্তিতেও পারেন।

আপনার কাছে আমি অশেষভাবে ঋণী, আপনার কাছে আমার জীবন বিক্রীত হইয়া আছে। কিন্তু কর্মের জন্য বহুকাল স্থানান্তরে ছিলাম বলিয়া সে-ঋণের কণামাত্র পরিশোধ করিতে পারি নাই। এখন ফিরিয়া আসিয়াছি, সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

আপনার গুণমুগ্ধ

শ্রীকোকনদ গুপ্ত

চিঠিখানা পড়িয়া আমি বলিলাম, 'এ চিঠি আমাদের পড়া উচিত হয়নি। অবশ্য গোপনীয় কিছু নেই, তবু এমন আন্তরিক কথা আছে যা অন্যের পড়া অপরাধ।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'তা তো বৃক্ছ। প্রেমিক প্রেমিকার চিঠি চুরি করে পড়ার মত এ চিঠিখানা পড়লেও মনটা লজ্জিত হয়ে ওঠে। কিন্তু উপায় কি বল! চিঠি আমার কিনা যাচাই করা চাই তো। কোকনদ গুপ্ত বলে কাউকে আমি চিনি না, আর চিনলেও তার কোনও মহৎ উপকার করেছি বলে স্মরণ হচ্ছে না।'

'তাহলে যার চিঠি তাকে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।'

'হাঁ। পুঁটিরামকে ডাকি।'

কিন্তু পুঁটিরাম আসিবার পূর্বেই চিঠির মালিক নিজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচের মেসের সকল অধিবাসীর সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি ছিল, ইহাকে কিন্তু পূর্বে দেখি নাই। লোকটি বেঁটে-খাটো দোহারা, বোধ করি মধ্যবয়স্ক—কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া বয়স অনুমান করিবার উপায় নাই। কপাল হইতে গলা পর্যন্ত মুখখানা পুঁড়িয়া, চামড়া কুঁচকাইয়া এমন একটা অস্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে যে পূর্বে তাহার চেহারা কিরূপ ছিল তাহা অনুমান করাও অসম্ভব। হঠাৎ মনে হয় যেন তিনি একটা বিকট মূখোশ পরিয়া আছেন। মুখে গোফ দাড়ি নাই, এমন কি চোখের পলক পর্যন্ত চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোখের দৃষ্টিতে মৎস্যচক্ষুর ন্যায় অনাবৃত নিম্পলক ভাব দেখিয়া সহসা চমকিয়া উঠিতে হয়।

ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিয়াই আমাদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাহার সহজ সাধারণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া যেন রূপকথার রাজ্য হইতে ফিরিয়া আসিলাম। তিনি স্মারের নিকট হইতে ঈষৎ কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'আমার নাম ব্যোমকেশ বসু। একখান চিঠি—'

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'আসুন। চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছলাম। আপনি এসেছেন—ভালই হল। বসুন। কিছু মনে করবেন না, নিজের মনে করে খাম খুলেছিলাম। এই নিন।'

পত্রটা হাতে লইয়া ভদ্রলোক ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন, তারপর বলিলেন, 'কোকনদ গুপ্ত! কৈ আমার তো—' ব্যোমকেশের দিকে চোখ তুলিয়া বলিলেন, 'আপনার চিঠি নয়? আপনি পড়েছেন নিশ্চয়।'

অপ্রস্তুতভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'পড়েছি, নিজের মনে করে—কিন্তু পড়ে দেখলাম আমার নয়। পিওন বলেছিল বটে কিন্তু খামের ওপর 'বোস' কথাটা এমনভাবে লেখা হয়েছে যে 'বঙ্গী' বলে ভুল হয়। জানেন বোধহয়, আমার নাম ব্যোমকেশ বঙ্গী?'

'জানি বৈকি। আপনি এ মেসের গৌরব; এখানে এসেই আপনার নাম শুনোঁছি। কিন্তু চিঠিটা আমার কিনা ঠিক বৃক্ছতে পারছি না। কোকনদ গুপ্ত নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে বটে, তবু—, যাহোক, আপনি যখন বলছেন আপনার নয় তখন আমারই হবে।'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'মহৎ লোকের পক্ষে উপকার করে ভুলে যাওয়াই তো স্বাভাবিক।'

'না না, তা নয়—অনেক দিনের কথা, তাই হঠাৎ মনে পড়ছে না। পরে হয়তো পড়বে।—আচ্ছা, নমস্কার।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি এ মেসে কত দিন এসেছেন?'

'বেশী দিন নয়। এই তো দিন পাঁচ-সাত।'

'ও—ব্যোমকেশ হাসিল, 'যাহোক, তবু এতদিনে একজন মিতে পাওয়া গেল। আচ্ছা, নমস্কার। সময় পেলে মাঝে মাঝে আসবেন, গল্প-সল্প করা যাবে।'

ভদ্রলোক আনন্দিত ভাবে সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিল, 'অনেক বেলা হয়ে গেল, চল নেয়ে খেয়ে নেওয়া যাক; তারপর দেশলাই চুরির মামলা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ভাবা যাবে। অনেক ভাববার কথা আছে; যে-বনে শিকার নেই সেই বন থেকে বাঘ মেয়ে আনতে হবে। আচ্ছা, আমাদের এই দু'নম্বর ব্যোমকেশবাবুটিকে আগে কোথাও দেখেছ বলে বোধ হচ্ছে কি?'

আমি দু'চুপে বলিলাম, 'না, ও-মুখ কদাচ দেখিনি। তুমি দেখেছ নাকি?'

ব্যোমকেশ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল, 'উহু'। কিন্তু গুঁর চলার ভঙ্গীটা যেন পরিচিত, কোথাও দেখেছি। সম্প্রতি নয়—অনেক দিন আগে। যাক্গে, এখন আর বাজে চিন্তা নয়।' বলিয়া মাথায় তেল ঘষিতে ঘষিতে স্নানের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

২

চিরদিনই লক্ষ্য করিয়াছি, চিন্তা করিবার একটা বড় রকম খোঁরাক পাইলে ব্যোমকেশ কেমন যেন নিশ্চল সমাহিত হইয়া যায়। তখন তাহার সহিত কথা কহিতে যাওয়া প্রাণান্তকর হইয়া উঠে; হয় কথা শুনিতে পায় না, নয়তো এমন তেরিয়া হইয়া উঠে যে হাতাহাতি না করিয়া আর উপায়ান্তর থাকে না, কিন্তু আজ ম্বপ্রহরে আহারাদির পর সে যখন বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল এবং সিগারেটের পর সিগারেট পুড়াইয়া ছাই করিয়া ফেলিতে লাগিল, তখন তাহার ভাবগতিক দেখিয়া বুঝিলাম—কোনও কারণে তাহার একাগ্র চিন্তার পথে বিঘ্ন হইয়াছে, চেষ্টা করিয়াও সে মনকে ঐকান্তিক চিন্তায় নিয়োজিত করিতে পারিতেছে না। তারপর সে যখন চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া এ-ঘর ও-ঘর ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আজ হল কি তোমার! অমন ফিজেন্ট করছ কেন?'

ব্যোমকেশ লজ্জিতভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, 'কি জানি আজ কিছতেই মন বসাতে পারছি না, কেবলই বাজে কথা মনে আসছে—'

আমি বলিলাম, 'গুরুতর কাজ যখন হাতে রয়েছে তখন বাজে চিন্তায় সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

ঈষৎ বিরক্তভাবে ব্যোমকেশ বলিল, 'আমি কি ইচ্ছে করে বাজে চিন্তা করছি? আজ সকালের ঐ চিঠিখানা—'

'কোন চিঠি?'

'আরে ঐ যে কোকনদ গুস্ত। ঘুরে ফিরে কেবল ঐ কথাই মনে আসছে।'

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, 'ও চিঠিতে এমন কি আছে—'

'কিছুই নেই। তবু মনে হচ্ছে চিঠিখানা যদি আমাকেই লিখে থাকে—যদি—'

'ঠিক বুঝলুম না। চিঠির লেখককে তুমি চেনো না, আর একজন লোক সে-চিঠি নিজের বলে দাবী করছেন, তবু চিঠি তোমার হবে কি করে?'

'তা বটে—কিন্তু—চিঠির কথাগুলো তোমার মনে আছে?'

'খুব গদগদ ভাঙ্গ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ছাড়া তাতে তো আর কিছু ছিল না। এ নিয়ে এত দুর্ভাবনা কেন?'

'ঠিক বলেছ'—হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, 'মস্তককে বাজে চিন্তা করিবার প্রশ্ন দেওয়া কিছু নয়, ক্রমে একটা বদ-অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। নাঃ—এখন কেবল দেশলায়ের বাজ্ঞ ধ্যান জ্ঞান করব। আমি লাইব্রেরীতে চললুম, চা তৈরী হলে ডেকো।' বলিয়া লাইব্রেরী ঘরে ঢুকিয়া, যেন বাজে চিন্তাকে বাহিরে রাখিবার জন্যই দৃঢ়ভাবে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর বিকাল কাটয়া গেল; রাত্রি হইল। কিন্তু ব্যোমকেশের সেই অস্থির বিক্ষিপ্ত মনের অবস্থা দূর হইল না। বুঝিলাম, সে এখনও কিছু স্থির করিতে পারে নাই।

গভীর রাতে লেপ মূড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলাম, হঠাৎ ব্যোমকেশের ঠেলা খাইয়া জাগিয়া

উঠিলাম। বলিলাম, 'কি হয়েছে?'

ব্যামকেশ বলিল, 'ওহে, একটা মতলব মাথায় এসেছে—'

মাথার উপর লেপ চাপা দিয়া বলিলাম, 'এত রাতে মতলব?'

ব্যামকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, শোনো। যে লোক দেশলাই চুরি করেছে, সেই আমাকে মারবার চেষ্টা করছে—কেমন? এখন মনে কর, আমি যদি সত্যিই—'

আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে প্রাতরাশ করিতে করিতে বলিলাম, 'কাল রাতে তুমি কি সব বলিছিলে, শেষ পর্যন্ত শুনিনি।'

ব্যামকেশ গম্ভীর মুখে কাগজ দেখিতে দেখিতে বলিল, 'তা শুনবে কেন? কাল রাতে আমার মৃত্যু-সংবাদ তোমাকে দিলাম, তুমি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলে। এমন না হলে বন্ধু!'

আমি আঁকহাইয়া উঠিলাম, 'মৃত্যু-সংবাদ! মানে?'

'মানে শীঘ্রই আমার মৃত্যু হবে। কিন্তু তার আগে একবার কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করা দরকার।' ঘাড়ের দিকে তাকাইয়া সে বলিল, 'এখন সওয়া আটটা। নটার সময় বেরুলেই হবে।'

'কি আবেল-তাবেল বকছ বুদ্ধতে পারছি না।'

ব্যামকেশ মদু হাসিয়া কাগজে মন দিল। বুদ্ধিলাম, কাল গভীর রাতে টেভেজনার ঝোঁকে যাহা বলিয়া ফেলিয়াছিল এখন আর তাহা সহজে বলিবে না। নিশ্চয় কোনও অশুভ ফলি বাহির করিয়াছে; জানিবার জন্য মনটা ছটফট করিতে লাগিল। রাতে তাহার কথা শেষ হইবার আগেই ঘুমাইয়া পড়িয়া ভাল করি নাই।

মিনিট পাঁচেক নীরবে কাটিল। ব্যামকেশকে খোঁচা দিয়া কথাটা বাহির করা যাইতে পারে কিনা ভাবিতেছি, হঠাৎ সে কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, 'এক লাখ টাকা দিয়ে এক বাজ্র দেশলাই কিনবে?'

'সে আবার কি?'

'একজন ভদ্রলোক বিক্রী করতে চান। এই দ্যাখ।' বলিয়া সে সংবাদপত্র আমার হাতে দিল। দেখিলাম ম্বিতীয় পৃষ্ঠার মাঝখানে ব্র্যাকেট দিয়া ঘেরা এই বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে—

এক বাজ্র দিয়াশলাই বিক্রী আছে। দাম—এক লক্ষ টাকা। বাজ্রে কুড়িটা কাঠি আছে; প্রত্যেকটির মূল্য পাঁচ হাজার। খুচরা ক্রয় করা যাইতে পারে। ক্রয়ার্থী নিজ নাম ঠিকানা দিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিন। এই অমূল্য দ্রব্য মাত্র সাতদিন বাজারে থাকিবে, তারপর বিদেশে রপ্তানি হইবে। ক্রেতাগণ তৎপর হোন।

আমি যতক্ষণ এই বিস্ময়কর বিজ্ঞাপন পড়িতেছিলাম ততক্ষণ ব্যামকেশ বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আমি হতভম্ব মুখে তাহার পানে তুলিতেই সে বলিল, 'অতি বিচক্ষণ লোক। দেশলায়ের বাজ্র চুরি করে এখন আবার সেইটেই গভর্নমেন্টকে বিক্রী করতে চান। গভর্নমেন্ট না কিনলে, জাপান কিম্বা ইটালিকে বিক্রী করবেন এ ভয়ও দেখিয়েছেন।—চল।'

'কোথায়?'

'খবরের কাগজের অফিসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া যাক কিছু পাওয়া যায় কিনা। যদিও সে সম্ভাবনা কম।'

দ্রুত জুতা জামা পরিয়া ব্যামকেশের সহিত বাহির হইলাম।

'কালকেতু' অফিসে গিয়া কার্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইতে বিলম্ব হইল না। ব্যামকেশের প্রশ্ন শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'বিজ্ঞাপন বিভাগ আমার খাস এলাকায় নয়, তবে এ বিজ্ঞাপনটা সম্বন্ধে আমি জানি। ইন্সপেক্টর-করা খামখানা আমার হাতেই এসেছিল। মনেও আছে, তার কারণ এমন আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আমরা কখনও পাইনি।'

ব্যামকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহলে বিজ্ঞাপনদাতা লোকটিকে আপনি দেখেননি?'

‘না। বললুম তো, ডাকে বিজ্ঞাপনটা এসেছিল। খামের মধ্যে কুড়ি টাকার নোট আর বিজ্ঞাপনের খসড়া ছিল। প্রেরকের নাম ছিল না। খুবই আশ্চর্য হয়েছিলুম; কিন্তু তখন আমাদের কাজের সময়, তাই বিজ্ঞাপন বিভাগের ম্যানেজারকে ডেকে খসড়া তাঁর জিন্সা করে দিই, তারপর ভুলে গিয়েছি। ব্যাপার কি বলুন তো? দেশলায়ের বাস্ব দেখে সন্দেহ হচ্ছে, গুরুতর কিছ, নাকি?’

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল, ‘আপনাদের কানে পৌঁছবার মত এখনও কিছ, হয়নি আচ্ছা, প্রেরক সম্বন্ধে কোনও খবরই দিতে পারেন না? তার ঠিকানা?’

কার্যাদক্ষ মাথা নাড়িলেন, ‘খামের মধ্যে নোট আর বিজ্ঞাপন ছাড়া আর কিছ, ছিল না।’

‘ইন্স-ওর-করা খামে বিজ্ঞাপন এসেছিল বলছেন। খামের ওপরেও প্রেরকের নাম ঠিকানা ছিল না?’

কার্যাদক্ষ সচকিত ভাবে বলিলেন, ‘ওটা তো খেয়াল করিনি। নিশ্চয় ছিল। অত্যন্ত ধাকা উচিত। যতদূর জানি প্রেরকের নাম-ঠিকানা না থাকলে পোস্ট-অফিসে রেজিস্ট্রি চিঠি নেয় না—’

টেবিলের পাশে একটা প্রকাণ্ড ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেট ছিল, অধ্যক্ষ মহাশয় হঠাৎ উঠিয়া তাহার মধ্যে হাতড়াইতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিজয়গর্বে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ‘পেয়োঁছ—এই, এই নিন।’

সাধারণ সরকারী রেজিস্ট্রি খাম, তাহার কোণে প্রেরকের নাম ও ঠিকানা রহিয়াছে—
বি কে সিংহ

১৮/১, সীতারাম ঘোষের স্ট্রীট, কলিকাতা

ঠিকানা টুকিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমাদের পাড়াতেই দেখাছি।—এখন তাহলে উঠলুম, অকারণে বসে থেকে আপনার কাজের ক্ষতি করব না—বহু ধন্যবাদ!’

অধ্যক্ষ বলিলেন, ‘ধন্যবাদের দরকার নেই; যদি নতুন খবর কিছ, থাকে, আগে যেন পাই। জানেন তো, দেবকুমারবাবুর কেস আমরাই আগে ছেপেছিলাম।’

‘আচ্ছা, তাই হবে’ বলিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

‘কালকেতু’ অফিস হইতে আমরা সোজা সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে ফিরিলাম।
১৮/১ নম্বর বাড়িখানা ম্বিতল ও ক্ষুদ্র, রেলিং-এর উপর লেপ তোষক শুকাইতেছে, ভিতর হইতে কয়েকটি ছেলেমেয়ের পড়ার গুঞ্জন আসিতেছে।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘ভুল ঠিকানা। যাহোক, যখন এসেছি তখন খোঁজ নিয় যাওয়া যাক।’
ডাকাডাকি করিতে একজন চাকর বাহির হইয়া আসিল—‘কাকে চান বাবু?’

‘বাবু বাড়ি আছেন?’

‘না।’

‘এ বাড়িতে কে থাকে?’

‘দারোগাবাবু থাকেন।’

‘দারোগাবাবু? নাম কি?’

‘বীরেনবাবু।’

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চাকরটার মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ‘ও—বুঝেছি। তোমার বাবু বাড়ি এলে বোলো ব্যোমকেশবাবু দেখা করতে এসেছিলেন।’ বলিয়া হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া চলিল।

আমি বলিলাম, ‘তুমি বড় খুশী হয়েছ দেখাছি।’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘খুশী হওয়া ছাড়া উপায় কি! লোকটি এমন প্রচণ্ড রসিক যে মহাপ্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর রসিকতা করতে বাধে না। এমন লোক যদি আমার সঙ্গে একটু তামাসা করেন তাহলে আমার খুশী না হওয়াই তো খুশীতা!—তুমি এখন বাসায় যাও, আমি অন্য কাজে চললাম। ফিরে এসে তোমার সঙ্গে পরামর্শ হবে।’

হ্যারিসন রোডে আসিয়া পড়িয়াছিলাম, ব্যোমকেশ লাফাইয়া একটা চলন্ত ট্রামে উঠিয়া পড়িল।

৩

সেদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ আমাকে তাহার প্ল্যান প্রকাশ করিয়া বলিল।

প্ল্যান শুনিয়া বিশেষ আশাপ্রদ বোধ হইল না; এ যেন অজ্ঞাত পুরুরে মাছের আশার ছিপ ফেলা, চারে মাছ আসিবে কিনা কোনও স্থিরতা নাই।

আমার মন্তব্য শুনিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'সে তো বটেই, অন্ধকারে ঢিল ফেলা, লাগবে কিনা জানি না। যদি না লাগে তখন অন্য উপায় বার করতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কমিশনার সাহেবের মত আছে?'

'আছে।'

'আমাকে কিছুর করতে হবে?'

'স্রেফ মুখ বুজে থাকতে হবে, আর কিছুর নয়। আমি এখনই বেরিয়ে যাব; কারণ মরতে হলে আজই মরতে হয়, একটা দেশলায়ের বাস্তব আর ক'দিন চলে? তুমি ইচ্ছে করলে কাল সকালে শ্রীরামপুরে গিয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দর্শন করতে পার।'

'ইতিমধ্যে এখানে যদি কেউ তোমার খোঁজ করে, তাকে কি বলব?'

'বলবে, আমি গোপনীয় কাজে কলকাতার বাইরে গিয়েছি, কবে ফিরব ঠিক হৌ।'

'বীরেনবাবু, আজ বিকেলে আসতে পারেন, তাঁকেও ঐ কথাই বলব?'

কিয়ৎকাল ভ্রূ কুণ্ঠিত করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হাঁ, তাঁকেও ঐ কথাই বলবে। মোট কথা, এ সম্বন্ধে কোনও কথাই কইবে না।'

'বেশ'—মনে মনে একটু বিস্মিত হইলাম। বীরেনবাবু পুলিশের লোক, বিশেষতঃ এ ব্যাপারে তিনিই এক প্রকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী; তবু তাহার নিকট হইতেও গোপন করিতে হইবে কেন?

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্ন যেন বুদ্ধিতে পারিয়াই ব্যোমকেশ বলিল, 'বীরেনবাবুকে না বলার কোনও বিশেষ কারণ নেই, মামুলি সতর্কতা। বর্তমানে তুমি আমি আর কমিশনার সাহেব ছাড়া এ প্ল্যানের কথা আর কেউ জানে না, অবশ্য কাল আরও কেউ কেউ জানতে পারবে। কিন্তু যতক্ষণ পারা যায় কথাটা চেপে রাখাই বাঞ্ছনীয়! চাণক্য পণ্ডিত বলেছেন, মন্ত্রগুপ্তিই হচ্ছে কূটনীতির মুখবন্ধ; অতএব তুমি দৃঢ়ভাবে মুখ বন্ধ করে থাকবে।'

ব্যোমকেশ প্রস্থান করিবার আধঘণ্টা পরে বীরেনবাবু ফোন করিলেন।

'ব্যোমকেশবাবু কোথায়?'

'তিনি কলকাতার বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'জানি না।'

'কখন ফিরবেন?'

'কিছুই ঠিক নেই। তিন চার দিন দেরী হতে পারে।'

'তিন চার দিন! আজ সকালে আপনারা আমার বাসায় গিয়েছিলেন কেন?'

ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, 'তা জানি না।'

তারের অপরাধ প্রাপ্তে বীরেনবাবু একটা অসন্তোষ-সূচক শব্দ করিলেন, 'আপনি যে কিছুই জানেন না দেখছি। ব্যোমকেশবাবু কোন কাজে গেছেন তাও জানেন না?'

'না।'

বীরেনবাবু সশব্দে তার কাটিয়া দিলেন।

ক্রমে চারিটা বাজিল। পুঁটিরামকে চা তৈয়ার করিবার হুকুম দিয়া, এবার কি করিব ভাবিতোঁছি, এমন সময় দ্বারে মৃদু টোকা পড়িল।

উঠিয়া স্বার খুলিয়া দেখিলাম, আমাদের পূর্বদিনের পরিচিত দম্পানন ব্যোমকেশবাব।
তাঁহার হাতে একটি সংবাদপত্র।

তিনি বলিলেন, 'ব্যোমকেশবাব, বেরিয়েছেন নাকি?'

'হ্যাঁ। আসুন।'

তাঁহার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না, পূর্বদিনের আমন্ত্রণ স্মরণ করিয়া গল্প-
গুজব করিতে আসিয়াছিলেন। আমিও একলা বৈকালটা কি করিয়া কাটাইব ভাবিয়া
পাইতোঁছিলাম না, বোসজা মহাশয়কে পাইয়া অনন্দিত হইলাম।

বোসজা আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, 'আজ কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে,
সেইটে আপনাদের দেখাতে এনোঁছিলুম। হয়তো আপনাদের চোখে পড়েনি—' কাগজটা
খুলিয়া আমার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'দেখেছেন কি?'

সেই বিজ্ঞাপন! বড় প্ৰিভায় পড়িলাম। মিথ্যা কথা বিশ্বাসযোগ্য করিয়া বলিতে পারি
না, বলিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাই। অথচ ব্যোমকেশ চাণক্য-বাক্য উদ্ভূত করিয়া মূব
বন্ধ রাখিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছে। এইরূপ সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া কি খলিব
ভাবিতোঁছি, এমন সময় বোসজা মৃদুকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'পড়েছেন, অথচ
ব্যোমকেশবাব, কোনও কথা প্রকাশ করতে মানা করে গেছেন—না?'

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, 'সম্প্রতি দেশলায়ের কাঠি নিয়ে একটা মহা গণ্ডগোল বেধে গেছে।
এই সৈদিন দেবকুমারবাবুর মোকদ্দমা শেষ হল, তাতেও দেশলাই; আবার দেখাঁছি দেশলাইয়ের
বায়ের বিজ্ঞাপন—মূল্য এক লক্ষ টাকা। সাধারণ লোকের মধ্যে স্বভাবতই সন্দেহ হয়,
দুটোর মধ্যে কোনও যোগ আছে।' বলিয়া সপ্রশ্ন চক্ষে আমার পানে চাহিলেন।

আমি এবারও নীরব হইয়া রহিলাম। কথা কহিতে সাহস হইল না, কি জানি আবার
হয়তো বেফাঁস কিছুর বলিয়া ফেলিব।

তিনি বলিলেন, 'যাক ও কথা, আপনি হয়তো মনে করবেন আমি আপনাদের গোপনীয়
কথা বার করবার চেষ্টা করছি।' বলিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আমি হাঁফ ছাড়িয়া
ধাঁচলাম।

পর্দাটিরাম চা দিয়া গেল। চায়ের সঙ্গে ক্রিকেট, রাজনীতি, সাহিত্য, নানাবিধ আলোচনা
হইল। দেখিলাম লোকটি বেশ মিশরুক ও সদালাপী—অনেক বিষয়ে খবর রাখেন।

এক সময় জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, আপনার কি করা হয়? কিছুর মনে করবেন না,
আমাদের দেশে প্রশ্নটা অশিষ্ট নয়।'

তিনি একটু চুপ করিয়া বলিলেন, 'সরকারী চাকরি করি।'

'সরকারী চাকরি?'

'হ্যাঁ। তবে সাধারণ চাকরের মত দশটা চারটে অফিস করতে হয় না। চাকরিটা একটু
বিচিত্র রকমের।'

'ও—কি করতে হয়?' প্রশ্নটা ভদ্ররীতিসম্মত নয় বৃদ্ধিতোঁছিলাম, তবে কৌতূহল দমন
করিতে পারিলাম না।

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'রাজ্য শাসন করবার জন্যে গভর্নমেন্টকে প্রকাশ্যে ছাড়াও
অনেক কাজ করতে হয়, অনেক খবর রাখতে হয়; নিজের চাকরদের ওপর নজর রাখতে
হয়। আমার কাজ অনেকটা ঐ ধরনের।'

বিস্মতকণ্ঠে বলিলাম, 'সি আই ডি পুলিস?'

তিনি মৃদু হাসিলেন 'পুলিসের ওপরেও পুলিস থাকতে পারে তো। আপনাদের
এই বাসটি দিবি নিরিবালি, মেসের মধ্যে থেকেও মেসের বামেলা ভোগ করতে হয় না।
কর্তদিন এখানে আছেন?'

কথা পাল্টাইয়া লইলেন দেখিয়া আমিও আর কিছুর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না;
বলিলাম, 'আমি আছি বছর আশ্টেক, ব্যোমকেশ তার আগে থেকে আছে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণ ভাবে কথাবার্তা হইল। তাঁহার মূখের এরূপ অবস্থা কি করিয়া হইল জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কয়েক বছর আগে ল্যাবরেটরীতে কাজ করিতে করিতে হঠাৎ অ্যাসিডের শিশি ভাঙিয়া মূখে পড়িয়া যায়। সেই অবধি মূখের অবস্থা এইরূপ হইয়া গিয়াছে।

অতঃপর তিনি উঠিলেন। স্বারের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'দারোগা বীরেনবাবুর সঙ্গে আপনাদের জানাশোনা আছে। কেমন লোক বলতে পারেন?'

'কেমন লোক? তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের সূত্রে আলাপ। তাঁর চরিত্র সম্বন্ধে তো কিছু জানি না।'

'তাঁকে খুব লোভী বলে মনে হয় কি?'

'মাফ করবেন বোমকেশবাবু, তাঁর সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারি না।'

'ও—আচ্ছা। আজ চললাম।'

তিনি প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার কথাগুলো আমার মনে কাঁটার মত বিপীড়না রহিল। বীরেনবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে ইনি অনুসন্ধানসু কেন? বীরেনবাবু কি লোভী? পুলিশের কর্মচারী সাধারণত অর্থগৃহ্য হয় শূন্যিাছ। তবে বীরেনবাবু সম্বন্ধে কখনও কোনো কানাঘুষাও শূন্যি নাহি। তবে এ প্রশ্নের তাৎপর্য কি? এবং গভর্নমেন্টের এই পোপন ভূতটি কোন্ মতলবে আমাকে এই প্রশ্ন করিলেন?

পরদিন সকালে শয্যাভ্যাগ করিয়াই খবরের কাগজ খুলিলাম। যাহা প্রত্যাশা করিয়া ছিলাম তাহা বাহির হইয়াছে। বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠার শূন্যিতেই রহিয়াছে—

"গতকলা বেকালে সাড়ে পাঁচটার সময় শ্রীরামপুর স্টেশনের ওয়েটিং রুমে এক অজ্ঞাত ভদ্রলোক যুবকের লাস পাওয়া গিয়াছে। মৃতদেহে কোথাও ক্ষতিচহু নাহি। মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত। মৃতের বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, সূত্রী চেহারা, গোঁফ দাড়ি কামানো। পরিধানে বাদামী রংয়ের গরম পাঞ্জাবী ও সাদা শাল ছিল। যুবক কলিকাতা হইতে ৪-৫৩ মিঃ লোকাল ট্রেনে শ্রীরামপুরে আসিয়াছিল; পকেটে টিকিট পাওয়া গিয়াছে। যদি কেহ লাস সনাক্ত করিতে পারেন, শ্রীরামপুর হাসপাতালে অনুসন্ধান করুন।"

তাড়াতাড়ি মূখ-হাত ধুইয়া কিছু জলযোগ করিয়া শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। শ্বিতলে নামিয়া একতলার সিঁড়িতে পদার্পণ করিতে যাইব, পিছ ডাক পড়িল, 'অজিতবাবু, সন্মাল না হতে কোথায় চলেছেন?'

দেখিলাম, বোমকেশবাবু নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। আজ আর মিথ্যা কথা বলিতে বাধিল না, বেশ সড়াং করিয়া বাহির হইয়া আসিল—'খাচ্ছি ডায়মন্ড হারবাবে—এক বন্ধুর বাড়ি। বোমকেশ কবে ফিরবে কিছু তো ঠিক নেই, দুর্দিন ঘুরে আসি।'

'তা বেশ। আজকের খবরের কাগজ পড়েছেন?'

'কালকেতু'খানা বগলে করিয়া লইয়াছিলাম, বলিলাম, 'না, গাড়িতে পড়তে পড়তে যাব।' বলিয়া নামিয়া গেলাম।

রাস্তায় নামিয়া শিয়ালদহের দিকে কিছুদূর হাঁটিয়া গেলাম, তারপর দেখান হইতে ট্রাম ধরিয়া হাওড়া অভিমূখে রওনা হইলাম। নূতন মিথ্যা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে একটা অসুবিধা এই হয় যে ধরা পড়িবার লজ্জাটা সর্বদা মনে জাগরুক থাকে। ক্রমশ পরিপক হইয়া উঠিলে বোধকরি ও দুর্বলতা কাটিয়া যায়।

যাহোক, হাওড়ায় ট্রেনে চাপিয়া বেলা সাড়ে ন'টা আন্দাজ শ্রীরামপুর পের্ণিছিলাম। হাসপাতালের সম্মুখে একটি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহাকে লাসের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া অদূরে একটি ছোট কুঠরী নির্দেশ করিয়া দিলেন। কুঠরীটি মূল হাসপাতাল হইতে পৃথক, সম্মুখে একজন পুলিশ প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে।

কাচ ও তার নির্মিত ক্ষুদ্র ঘরটির সম্মুখে গিয়া আমার অভিপ্রায় বাস্তব করিলাম; ভিতরে প্রবেশ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। দেখিলাম, ঘরের মাঝখানে শানের মত লম্বা

বৌদর উপরে বোমকেশ শুইয়া আছে—তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত একটা কাপড় দিয়া ঢাকা। মদুখানা মৃত্যুর কাঠিন্যে স্থির।

আমি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, 'আবুহোসেন জাগো।'

বোমকেশ চক্ষু খুলিল।

'কতক্ষণ এইভাবে অবস্থান করছ?'

'প্রায় দু'ঘণ্টা। একটা সিগারেট পেলে বড় ভাল হত।'

'অসম্ভব। মৃত ব্যক্তি পিপিড খেতে পারে শুনোছি, কিন্তু সিগারেট খাওয়া একেবারে নিষিদ্ধ।'

'ঠিক জানো? মনুষ্যহিতায় কোনও বিধান নেই?'

'না। তারপর, ক'জন লোক দেখতে এল?'

'মাত্র তিনজন। স্থানীয় লোক, নিতান্তই লোফার ক্লাশের।'

'তবে?'

'এখনও হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। আজ সারাদিন আছে—কালকেও অন্তত সকালবেলাটা পাওয়া যাবে।'

'দু'দিন ধরে এইখানে পড়ে থাকবে? মনে কর যদি বিজ্ঞাপনটা তাঁর চোখে না পড়ে?'

'চোখে পড়তে বাধ্য। তিনি এখন অনবরত বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করছেন।'

'তা বটে! যাহোক, এখন আমি কি করব বল দেখি।'

'তুমি এই ঘরের কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে বসে থাকো, যারা আসছে তাদের ওপরে লক্ষ্য রাখো। অবশ্য পুলিস নজর রেখেছে; যিনি এই হতভাগ্যকে পরিদর্শন করতে আসছেন তাঁরই পিছনে গুম্বস্তচর লাগছে। কিন্তু অধিকন্তু ন দোষায়। তুমি যদি কোনো চেনা লোক দেখতে পাও, তখন এসে আমাকে খবর দেবে। আমার মূর্শকিল হয়েছে চোখ খুলতে পারছি না, কাজেই যারা এখানে পায়ের ধুলো দিচ্ছেন তাঁদের শ্রীমুখ দর্শন করা হচ্ছে না। মড়া যদি মির্টামিট করে তাকাতে আরম্ভ করে তাহলে বিষম হৈ চৈ পড়ে যাবে কিনা।'

'বেশ। আমি কাছাকাছিই রইলুম। পুলিস আবার হাঙ্গামা করবে না তো?'

'স্বাভাবিক প্রহরীকে চুপি চুপি নিজের পরিচয় দিয়ে যেও, তাহলে আর হাঙ্গামা হবে না। তিনি একটি বর্ণচোরা আম; দেখতে পুলিস কনস্টবল বটে কিন্তু আসলে একজন সি আই ডি দারোগা।'

বাহিরে আসিয়া ছদ্মবেশী প্রহরীকে আত্মপরিচয় দিলাম; তিনি অদূরে একটা মেতির ঝাড় দেখাইয়া দিলেন। মেতির ঝাড়টি এমন জায়গায় অবস্থিত যে তাহার আড়ালে লুকাইয়া বসিলে বোমকেশের কুঠরীর দ্বার পরিষ্কার দেখা যায়, অথচ বাহির হইতে ঝোপের ভিতরে কিছু আছে কিনা বোঝা যায় না।

ঝোপের মধ্যে গিয়া বসিলাম। চারিদিক ঘেরা থাকিলেও মাথার উপর খোলা; দিব্য আরামে রোদ পোহাইতে পোহাইতে সিগারেট ধরাইলাম।

ক্রমে বেলা যত বাড়িতে লাগিল, দর্শন-অভিলাষী লোকের সংখ্যাও একটি দুইটি করিয়া বাড়িয়া চলিল। উৎসুক ভাবে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। সকলেই অপরিচিত, চেহারা দেখিয়া বোধ হইল, অধিকাংশই বেকার লোক একটা নতুন ধরনের মজা পাইয়াছে।

ক্রমে এগারোটা বাজিল, মাথার উপর সূর্যদেব প্রথর হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রূপারটা মাথায় চাপা দিয়া বসিয়া রইলাম। একটা নৈরাশ্যের ভাব ধীরে ধীরে মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে-ব্যক্তি দেশলাই চুরি করিয়াছে, সে শ্রীরামপুরে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির লাস দেখিতে আসিবে কেন? আর, যদি বা আসে, এতগুলো লোকের মধ্যে তাহাকে দেশলাই-চোর বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইবে কিরূপে? সত্য, সকলের পিছনেই পুলিস লাগিবে, কিন্তু তাহাতেই বা কি সুবিধা হইতে পারে? মনে হইল, বোমকেশ বৃথা পণ্ডশ্রম করিয়া মরিতেছে।

বোমকেশের ঘরের দিকে চাহিয়া এই সব কথা ভাবিতেছিলাম, হঠাৎ চমক ভাঙিয়া

গেল। একটি লোক দ্রুতপদে আসিয়া কুঠরীতে প্রবেশ করিল; বোধহয় পাঁচ সেকেন্ড পরেই আবার বাহির হইয়া আসিল—প্রহরীর প্রশ্নে একবার মাথা নাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

লোকটি আমাদের মেসের নতুন ব্যোমকেশবাবু। তাঁহাকে দেখিয়া এতই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম যে তিনি চলিয়া যাইবার পরও কিয়ৎকাল বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে বসিয়া রহিলাম তারপর খড়মড় করিয়া উঠিয়া সেই ঘরের অভিমুখে ছুটিলাম।

ব্যোমকেশ বোধকার আমার পদশব্দ শুনিয়া আবার মড়ার মত পড়িয়া ছিল, আমি তাহার কাছে গিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলাম, 'ওহে, কে এসেছিলেন জানো? তোমার মিতে—মেসের সেই নতুন ব্যোমকেশবাবু।'

ব্যোমকেশ সটান উঠিয়া বসিয়া আমার পানে বিস্ফারিত নেত্রে তাকাইল। তারপর বেদী হইতে লাফাইয়া নীচে নামিয়া বলিল, 'ঠিক দেখেছ? কোনও ভুল নেই?'

'কোনও ভুল নেই।'

'যাঃ, এতক্ষণে হয়তো পালাল।'

ব্যোমকেশের গায়ে জামা কাপড় ছিল বটে কিন্তু জুতা পায়ে ছিল না, সেই অবস্থাতেই সে বাহিরের দিকে ছুটিল। হাসপাতালের সম্মুখে যে ভদ্রলোকটিকে আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, তিনি তখনও সেখানে ছিলেন; ব্যোমকেশ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় গেল? এখনি যে-লোকটা এসেছিল?'

ভদ্রলোক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, 'সেই নাকি?'

'হ্যাঁ—তাকেই গ্রেপ্তার করতে হবে।'

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, 'সে পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে!'

'সে কলকাতা থেকে ট্যান্ডিতে এসেছিল, আবার ট্যান্ডিতে চড়ে পালিয়েছে। আমাদের মোটর-বাইকের বন্দাবস্ত করা হয়নি, তাই—'

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'এর জবাবদিহি আপনি করবেন।—এস অজিত, যদি একটা ট্যান্ডি পাওয়া যায়—হয়তো এখনও—'

কিন্তু ট্যান্ডি পাওয়া গেল না। অগত্যা বাসে চড়িয়াই কলকাতা যাত্রা করিলাম।

পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'উনিই তাহলে?'

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িল, 'হুঁ।'

'কিন্তু বুকলে কি করে?'

'সে অনেক কথা—পরে বলব।'

'আচ্ছা, উনি অত তাড়াতাড়ি পালালেন কেন? তুমি যদি মরে গিয়েই থাকো—'

'উনি শিকারী বেরাল, ঘরের মধ্যে পা দিয়েই বুকোছিলেন যে ফাঁদে পা দিয়েছেন। তাই চটপট সরে পড়লেন।'

সাড়ে বারোটার সময় মেসে পেঁপীছিয়া দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলাম সিঁড়ির মুখে মেসের ম্যানেজার দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যোমকেশবাবু এসেছিলেন?'

ম্যানেজার সবিস্ময়ে নন্দনপদ ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'দু' নম্বর ব্যোমকেশবাবু? তিনি তো এই খানিকক্ষণ হল চলে গেলেন। বাড়ি থেকে জরুরী খবর পেয়েছেন, তাই তাড়াতাড়ি চলে যেতে হল। তিনিও আপনার খোঁজ করছিলেন। আপনাকে নমস্কার জানিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি যেন দুঃখ না করেন, শীগ্গির আবার দেখা হবে।'

শিষ্টতার এই প্রবল ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'তাঁর ঘর কোনটা?'
'ঐষে পাঁচ নম্বর ঘর।'

পাঁচ নম্বর ঘরের স্কারে তালা লাগানো ছিল, ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'এর চাবি কোথায়?'

ম্যানেজার বলিলেন, 'আমার কাছে একটা চাবি আছে, কিন্তু—'

'খুলুন।'

চাবির খোলো পকেট হইতে বাহির করিতে করিতে ম্যানেজার উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, 'কি—কি হয়েছে ব্যোমকেশবাবু?'

'বিশেষ কিছু নয়; যে ভদ্রলোকটি এই ঘরে ছিলেন তিনি একজন দাগী আসামী।'
ম্যানেজার তাড়াতাড়ি স্কার খুলিয়া দিলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, 'তিনি তো কিছুই নিয়ে যাননি দেখছি। বাস্তব বিছানা সবই রয়েছে।'

ম্যানেজার বলিলেন, 'তিনি কেবল ছোট হ্যান্ডব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে গেছেন—
আর সবই রেখে গেছেন। বললেন, দু'চার দিনের মধ্যে ফিরবেন, আমিও ভাবলুম—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'ঠিক কথা। আপনি এবার থানার দারোগা বীরেনবাবুর কাছে খবর পাঠান—তাকে জানান যে চোরের সম্মান পাওয়া গেছে, তিনি যেন শীগগির আসেন।—
আমরা তত্তক্ষণ এই ঘরটা একবার দেখে নিই।'

ম্যানেজার প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ঘরের আসবাবপত্রের মধ্যে অনুসন্ধান আরম্ভ করিল।
এই মেসের প্রায় সব ঘরগুলিই বড় বড়, প্রত্যেকটিতে দু' বা তিনজন করিয়া ভদ্রলোক
থাকিতেন। কেবল এই পাঁচ নম্বর ঘরটি ছিল ছোট, একজনের বেশী থাকা চলিত না।
ভাড়াও কিছু বেশী পড়িত, তাই ঘরটা অধিকাংশ সময় খালি পড়িয়া থাকিত। যিনি
মেসে থাকিয়াও স্বাভাবিক ও নিভৃততা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক তাঁহার পক্ষে ঘরটি চমৎকার।

ঘরে গোটা দুই ট্রাঙ্ক ও বিছানা ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না। ব্যোমকেশ বিছানাটা
পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, 'শীতের সময়, অথচ লেপ তোষক বালিশ কিছুই নিয়ে যাননি।
অর্থাৎ—বুঝেছে?'

'না। কি?'

'অন্যত্র আর একসেট বন্দোবস্ত আছে।'

ব্যোমকেশ বিছানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল, কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি আশা করছ দেশলায়ের বাস্তবী তিনি এই ঘরে
রেখে গেছেন?'

'না—তাহলে তিনি ফিরে এলেন কেন? আমি খুঁজছি তার বর্তমান ঠিকানা; যদি
কোথাও কিছু পাই যা-থেকে তাঁর প্রকৃত নামধামের কিছু ইশারা পাওয়া যায়। তাঁর
সত্যিকারের নাম যে ব্যোমকেশ বসু নয় এটা বোধ হয় তুমিও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ।'

'মানে—কি বলে—হ্যাঁ, পেরেছি বৈকি। কিন্তু 'ব্যোমকেশ' ছদ্মনাম গ্রহণ করবার
উদ্দেশ্য কি?'

বিছানার উপর বসিয়া ব্যোমকেশ ঘরের এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে বলিল, 'উদ্দেশ্য
প্রতিহিংসা সাধন। অজিত, প্রতিহিংসার মনস্তত্ত্বটা বড় আশ্চর্য। তুমি গল্প-লেখক, সুতরাং
মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সবই জানো। তোমাকে বলাই বাহুল্য যে নেপথ্য থেকে প্রতিহিংসা সাধন
করে মানুষ সুখ পায় না; প্রত্যেকটি আঘাতের সঙ্গে সে জ্ঞানিয়ে দিতে চায় যে সে প্রতিহিংসা
নিচ্ছে। শত্রু যদি জানতে না পারে কোথা থেকে আঘাত আসছে, তাহলে প্রতিহিংসার
অর্ধেক আনন্দই ব্যর্থ হয়ে যায়। ইনি তাই একেবারে আমার বুকের ওপর এসে চেপে
বসেছিলেন। এটা যদি সুসভ্য বিংশ শতাব্দী না হয়ে প্রস্তর-যুগ হত, তাহলে এত ছিল

চাতুরীর দরকার হত না, উনি একেবারে পাথরের মৃগদুর নিয়ে আমার মাথায় বসিয়ে দিতেন। কিন্তু এখন সেটা চলে না, ফাঁসি যাবার ভয় রয়েছে। মোট কথা, প্রতিহিংসার পন্থাটিটা বদলেছে বটে কিন্তু মনস্তত্ত্বটা বদলায়নি। আজ যে উনি আমার মৃত মৃগখানা দেখবার জন্যে শ্রীরামপুরে ছুটেছিলেন, সেও ওই একই মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে।' ব্যোমকেশ খামখেয়ালী গোছের হাসিল—'চিঠিখানার কথা মনে আছে তো, সেটা আমারই উদ্দেশ্যে লেখা এবং উনি নিজেই লিখেছিলেন। তার বাহ্য কৃতজ্ঞতার আড়ালে লুকিয়ে ছিল অতি রূর ইঙ্গিত। তিনি যতদূর সম্ভব পরিষ্কার ভাবেই লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি ভোলেননি—ঋণ পরিশোধ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছেন। আমরা অবশ্য তখন চিঠির মানে ভুল বুঝেছিলাম, তবু—আমার মনে একটু খটকা লেগেছিল। তোমার বোধহয় মনে আছে।'

সেই চিঠিতে লিখিত কথাগুলো যেন এখন নতুন চক্ষে দেখতে পাইলাম। বলিলাম, 'মনে আছে। কিন্তু তখন কে জানত—; আচ্ছা, লোকটা তোমার কোনও পুরনো শত্রু—না?' 'তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।'

'লোকটা কে তা কিছুর বুঝতে পারছ না?'

'বোধহয় একটু একটু পারাছি। কিন্তু এখন ও কথা যাক, আগে তাঁর বাস্তবগুলো দেখি।'

একটা বাস্তবের চাবি খোলাই ছিল, তাহাতে দৈনিক ব্যবহার্য কাপড় চোপড় ছাড়া আর কিছু ছিল না। অন্যটার তালা লইয়া ব্যোমকেশ দু'একবার নাড়াচাড়া করিয়া একটু চাপ দিতেই সেটাও খুলিয়া গেল। ভিতরে কয়েকটা গরম কোট পাঞ্জাবী ইত্যাদি রহিয়াছে। সেগুলো বাহির করিয়া তলায় অনুসন্ধান করিতে এক শিশি স্পিরিট-গাম ও কিছু বিন্দুনিষ্কর ক্রেপ চুল বাহির হইয়া পড়িল। সেগুলি তুলিয়া ধরিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'হুঁ, মৃগে যার অ্যাসিড ছাপ মেরে দিয়েছে তাকে মাঝে মাঝে গৌফ দাড়ি পরে ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় বৈকি। এই সব পরে সম্ভবতঃ ইনি গ্রামে আমার দেশলাই বদলে নিয়েছিলেন।'

ক্রেপ ইত্যাদি সরাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ আবার কয়েকটা জিনিস দুই হাতে বাস্তবের ভিতর হইতে বাহির করিল, বলিল, 'কিন্তু এগুলো কি?'

মোমজামার মত খানিকটা কাপড়ে কি কতকগুলো জড়ানো রহিয়াছে। ব্যোমকেশ সাবধানে সেগুলো মেঝের উপর রাখিয়া মোড়ক খুলিল। একটি আধ আউন্সের খালি শিশি, কয়েক-খন্ড সীলমোহর করিবার লাল রংয়ের গালা ও অর্ধ দন্ড একটি মোমবাতি রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ শিশির ছিপি খুলিয়া আত্মাণ গ্রহণ করিল, মোমবাতি ও গালা খুব মনো-যোগের সহিত দেখিল। শেষে মোমজামাটা তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিল। দেখিলাম সাধারণ মোমজামা নয়, খুব ভাল জাতীয় ওয়াটার-প্রুফ কাপড়—ঈষণ নীলাভ এবং স্বচ্ছ—আসতনে একটা রুমালের মত। বর্তমানে তাহার একটা কোণের প্রায় সিকি ভাগ কাপড় নাই—মনে হয় কোনও কারণে ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

ব্যোমকেশ ধীরে ধীরে বলিল, 'শিশি, গালা, মোমবাতি এবং ওয়াটারপ্রুফের একটু সমাবেশ। মনে বুঝতে পারলে?'

'না—কি মানে?'

'ওয়াটারপ্রুফ থেকেও কিছুর আন্দাজ করতে পারলে না?'

হতাশভাবে বলিলাম, 'কিছুর না। তুমি কি বুঝলে?'

'সবই বুঝেছি, শুধু ভদ্রলোকের বর্তমান ঠিকানা ছাড়া।—চল, এখানকার কাজ আমাদের শেষ হয়েছে।'

এই সময় ম্যানেজারবাবু ফিরিয়া আসিলেন, বলিলেন, 'দারোগাবাবুকে খবর দিয়েছি, তিনি এলেন বলে।'

'বেশ।—আচ্ছা ম্যানেজারবাবু, আমার এই নিতৌটি যখন চলে গেলেন তখন আপনি নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে সদর পৰ্যন্ত গিয়েছিলেন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, গিয়েছিলুম।'

‘ট্যান্ডার নম্বরটা আপনার চোখে পড়েনি?’

মাথা নাড়িয়া ম্যানেজার বলিলেন, ‘আজ্ঞে না! নীল রঙের পুরনো ট্যান্ডার—ড্রাইভার একজন শিখ—এইটুকুই লক্ষ্য করেছিলুম।’

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘সে সময় দোরের কাছে আর কেউ ছিল?’

ম্যানেজার ভাবিয়া বলিলেন, ‘ভুললোক কেউ ছিলেন বলে তো মনে পড়ছে না, তবে আপনাদের চাকর পুন্ডিলাম দাওয়াল বসেছিল। আপনারা বাসায় ছিলেন না, তাই সে বোধহয় একটু—’

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ বলিল, ‘পুন্ডিলাম থাকা না-থাকা সমান। সে তো আর ইংরিজ জানে না, কাজেই ট্যান্ডার নম্বর চোখে দেখালও পড়তে পারবে না।—চল অজিত, দেড়টা বাজল, পেটও বাপান্ত করছে। ম্যানেজারবাবু, এবেলা দু’টি ভাত আমাদের দিতে হবে। অবশ্য যদি অসুবিধা না হয়।’

ম্যানেজার সানন্দে বলিলেন, ‘বিলক্ষণ! অসুবিধে কিসের! ব্যোমকেশবাবু—মানে, দু’নম্বর ব্যোমকেশবাবু—ভাত হাঁড়িতেই আছে, তিন তো খানান। আপনারা স্নান করুনগে, আমি ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি।’

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘মন্দ ব্যবস্থা নয়। দু’নম্বর ব্যোমকেশবাবু বাড়া ভাত এক নম্বর ব্যোমকেশবাবু খাবেন। দু’নিয়াতে এই ব্যাপার তো হরদম চলছে—কি বল অজিত? এখন দু’নম্বর ব্যোমকেশবাবু কোথায় বসে কার ভাত খাচ্ছেন সেইটে জানতে পারলে বড় খুশী হতুম।’

আহার তখনো শেষ হয় নাই, বীরেনবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোনও রকমে অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া বাহরের ঘরে প্রবেশ করিতেই বীরেনবাবু উঠিয়া প্রশ্ন-ব্যাকুল নেড়ে ব্যোমকেশের পানে তাকাইলেন। তাহার সমস্ত দেহ একটা জীবন্ত জিজ্ঞাসার চিহ্নের আকার ধারণ করিল।

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আপনার এখনো খাওয়া হয়নি দেখছি।’

‘না। খাবার জন্যে বাড়ি যাচ্ছিলুম এমন সময় আপনার ডাক পেলুম।—কি হল ব্যোমকেশবাবু? ধরেছেন তাকে?’

‘বলিছি। কিন্তু তার আগে আপনাকে কিছু খাবার আনিয়া দিই।’

‘খাবার দরকার নেই। তবে যদি এক পেয়ালা চা—’

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, ‘বেশ। এবং সেই সঙ্গে দু’টো নিষিদ্ধ ডিম।—পুন্ডিলাম।’

পুন্ডিলাম হুকুম লইয়া প্রস্থান করিলে পর, ব্যোমকেশ বীরেনবাবুকে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিল। তাহাকে না বলিয়া এত কাজ করা হইয়াছে, ইহাতে বীরেনবাবু একটু আহত হইলেন। ব্যোমকেশ তাহাকে যথা সম্ভব মিষ্ট করিয়া সান্থনা দিল, তথাপি তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, ‘আমি যদি জানতুম তাহলে সে এমন হাত-ফস্কে পালাতে পারত না। এখন তাকে ধরা কঠিন হবে। এতক্ষণে সে হয়তো কলকাতা থেকে বহু দূরে চলে গেছে।’

ব্যোমকেশ মেকের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, ‘আমার কিন্তু মনে হয় সে কলকাতাতেই আছে। কারণ সে মার্কা-মারা লোক, ওরকম মুখ নিজে মানুষ বেশী দূর পালাতে পারে না। কলকাতা শহরই তার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ।’

বীরেনবাবু বলিলেন, ‘তাহলে এখন কর্তব্য কি? তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে ইস্তাহার জারি করা ছাড়া আর তো কোনো পথ দেখছি না।’

ব্যোমকেশ ভাবিতে ভাবিতে বলিল, ‘ওটা তো হাতেই আছে। কিন্তু তার আগে—যদি ট্যান্ডার নম্বরটা পাওয়া যেত—’

ইতিমধ্যে পুন্ডিলাম চা ইত্যাদি আনিয়া বীরেনবাবুকে সম্মুখে রাখিতেছিল, ব্যোমকেশ তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, ‘পুন্ডিলাম, তোমার ইংরিজি শেখা দরকার, আজই একখানা প্যারী সুরকারের ফার্স্টবুক কিনে আনবে। অজিত আজ থেকে তোমাকে ইংরিজি শেখাবে।’

অবান্তর কথায় বীরেনবাবু বিস্মিত ভাবে ব্যোমকেশের দিকে চাহিলেন, ব্যোমকেশ বলিল, 'ও যদি ইংরিজ জানত তাহলে আজ কোনও হাঙ্গামাই হত না।' পুঁটিরামের ম্বারের কাছে অবস্থিতি ও ট্যান্ড দর্শনের কথা বলিয়া ব্যোমকেশ বিমর্ষভাবে মাথা নাড়িল।

পুঁটিরাম মুখের সম্মুখে মূর্ছিত তুলিয়া সসম্ভ্রমে একটু কাশিল—

'আজ্ঞে—'

'কি?'

'আজ্ঞে, টোঞ্জর লম্বর আমি দেখেছি।'

'তা দেখেছ—কিন্তু পড়তে তো পারোনি।'

'আজ্ঞে, পড়তে পেরেছি। চারের পিঠে দুটো শূন্য, তারপর আবার একটা চার।'

আমরা তিনজনে অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম। শেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তুই ইংরিজ পড়তে জানিস?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'বাংলাতে লেখা ছিল বাবু, সেই জনোই তো চোখে পড়ল।'

আমরা চক্ষু গোলাকৃতি করিয়া রহিলাম। তারপর ব্যোমকেশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—'বুঝেছি।' পুঁটিরামের পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, 'বহুত আচ্ছা! পুঁটিরাম, আজ থেকে তোমার মাইনে এক টাকা বাড়িয়ে দিলুম।'

পুঁটিরাম সহর্ষে এবং সলজ্জে বলিল, 'আজ্ঞে, বাইরের দাওয়ায় বসেছিলুম, ট্যান্ডতে বাংলা লম্বর দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। তাইতো লম্বরটা মনে আছে হুজুর।'

বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'কিন্তু ব্যাপারটা কি? ট্যান্ডতে বাংলা লম্বর এল কোথেকে?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল, 'বাংলা নয়—ইংরিজ লম্বরই ছিল। কিন্তু আমাদের ভাগ্যক্রমে সেটা বাংলা হয়ে পড়েছিল। বুঝলেন না? আসলে লম্বরটা ৮০০৮, পুঁটিরাম তাকে পড়েছে ৮০০৮।'

'ওঃ—' বীরেনবাবুর চক্ষুস্বয় ও অধরোষ্ঠ কিছুদ্ধকণ বতুলাকার হইয়া রহিল।

অবশেষে ব্যোমকেশ বলিল, 'তাহলে আর দেরী করে লাভ কি? বীরেনবাবু, এ তো আপনার কাজ। নীল রংয়ের গাড়ি, চালক শিখ, নম্বর ৮০০৮—খুঁজে বার করতে বেশী কষ্ট হবে না। আপনি তাহলে বেরিয়ে পড়ুন, খবরটা যত শীঘ্র পাওয়া যায় ততই ভাল।'

'আমি এখন যাচ্ছি—' বীরেনবাবু উঠিয়া এক চুমুকে চা নিঃশেষ করিয়া বলিলেন, 'সন্ধ্যার আগেই আশা করি খবর নিয়ে আসতে পারব।'

'শুধু খবর নয়, একেবারে গাড়ি ড্রাইভার সব নিয়ে হাজির হবেন। ইতিমধ্যে আমি কমিশনার সাহেবকে টেলিফোন যোগে খবরটা জানিয়ে দিই। তিনি নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।'

গমনোদ্যত বীরেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আসামীর নাম বা পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে আপনি কোনও খবর দিতে পারেন না?'

'নির্ভুল খবর এখন দিতে পারি কিনা জানি না, তবু—' এক টুকরা কাগজে একটা লম্বর লিখিয়া তাহার হাতে দিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আলিপুর জেলে এই কয়েদীর ইতিহাস খুঁজলে হয়তো কিছু পরিচয় পাবেন।'

বীরেনবাবু বলিলেন, 'লোকটা তাহলে দাগী?'

'আমার তো তাই মনে হয়। কাল সকালে তার খোঁজ করে লম্বরটা বার করেছিলুম, কিন্তু তার জেলের ইতিহাস পড়বার ফুরসত হয়নি। আপনি সরকারী লোক, এ কাজটা সহজেই পারবেন—অফিসের মারফত। কেমন?'

'নিশ্চয়।'

বীরেনবাবু কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করিয়া পকেটে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে বীরেনবাবুর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ব্যোমকেশ তাহার রিভলবারটা তেল ও ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল।

আমি বলিলাম, 'বীরেনবাবু তো এখনো এলেন না।'

'এইবার আসবেন।' ব্যোমকেশ একবার ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা ব্যোমকেশ, লোকটার আসল নাম কি? তুমি নিশ্চয় জানো?'

'আমি তো বলিছি, এখনও ঠিক জানি না।'

'তবু আন্দাজ তো করেছ।'

'তা করেছি।'

'কে লোকটা? আমার চেনা নিশ্চয়—না?'

'শুধু চেনা নয়, তোমার একজন পুরনো বন্ধু।'

'কি রকম?'

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'সেই চিঠিখানাতে কোকনদ গুপ্ত নাম ছিল মনে আছে বোধ হয়। তা থেকে কিছুর অনুমান করতে পার না?'

'কি অনুমান করব। কোকনদ গুপ্ত তো ছদ্মনাম।'

'সেই জন্যই তো তাতে আরো বেশী করে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। মানুষের সত্যিকার নামকরণ হয় সম্পূর্ণ খেয়ালের বশে, অধিকাংশ স্থলেই কানা ছেলের নাম হয় পদ্মলোচন। যেমন তোমার নাম অজিত, আমার নাম ব্যোমকেশ—আমাদের বর্ণনা হিসাবে নাম-দুটোর কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু মানুষ যখন ভেবে চিন্তে ছদ্মনাম গ্রহণ করে তখন তার মধ্যে অনেকখানি ইঙ্গিত পূরে দেবার চেষ্টা করে। কোকনদ শব্দটা তোমাকে কিছুর মনে করিয়ে দিচ্ছে না? কোনও একটা শব্দগত সাদৃশ্য?'

আমি ভাবিয়া বলিলাম, 'কি জানি, আমি তো এক কোকেন ছাড়া আর কিছুর সঙ্গেই সাদৃশ্য পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, 'কোকনদের সঙ্গে কোকেনের সাদৃশ্য মোটেই কাব্যানুমোদিত নয়, তাই তোমার মন উঠছে না—কেমন? কিন্তু—ঐ বীরেনবাবু আসছেন, সঙ্গে আর একজন। অজিত, আলোটা জেদে দাও, অন্ধকার হয়ে গেছে।'

বীরেনবাবু প্রবেশ করিলেন; তাহার সঙ্গে একটি দীর্ঘাকৃতি শিখ। শিখের মুখে প্রচুর গোঁফ-দাড়ি—গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাদের উচ্চত্বলতা কিঞ্চিৎ সংযত করা হইয়াছে। মাথায় বেণী। ব্যোমকেশ উভয়কে আদর করিয়া বসাইল।

কালবায় না করিয়া ব্যোমকেশ শিখকে প্রশ্ন আরম্ভ করিল। শিখ বলিল, আজ সকালের আরোহীকে তাহার বেশ মনে আছে। তিনি বেলা আন্দাজ সাড়ে দশটার সময় তাহার ট্যান্সি ভাড়া করিয়া শ্রীরামপুরে যান; সেখানে হাসপাতালের অনতিদূরে গাড়ি রাখিয়া তিনি হাসপাতালে প্রবেশ করেন। অল্পক্ষণ পরেই আবার লোর্টিয়া আসিয়া দ্রুত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে আদেশ করেন। কলিকাতায় পহুঁছিয়া তিনি এই বাসায় নামেন, তারপর সামান্য কিছু সামান্য লইয়া আবার গাড়িতে আরোহণ করেন। এখান হইতে বউবাজারের কাছাকাছি একটা স্থানে গিয়া তিনি শেষবার নামিয়া যান। তিনি ভাড়া চুকাইয়া দিয়া উপরন্তু দুই টাকা বখশিশ দিয়াছেন; ইহা হইতে শিখের ধারণা জন্মিয়াছে সে লোকটি অতিশয় সাধু ব্যক্তি।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল, 'তিনি শেষবার নেমে গিয়ে কি করলেন?'

শিখ বলিল, তাহার যতদূর মনে পড়ে তিনি একজন ঝাঁকামুটের মাথায় তাহার বেগু ও জলের সোরাহি চড়াইয়া দিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন; কোনদিকে গিয়াছিলেন তাহা সে লক্ষ্য করে নাই।

ব্যোমকেশ বলিল, 'তুমি তোমার গাড়ি এনেছ। সেই বাবুটিকে যেখানে নামিয়ে দিয়েছিলে আমাদের ঠিক সেইখানে পৌঁছে দিতে পারবে?'

শিখ জানাইল যে বে-শক্ পারিবে।

তখন আমরা দুইজনে তাড়াতাড়ি তৈয়ার হইয়া নীচে নামিলাম। নীল রংয়ের গাড়ি বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ৮০০৮ নম্বর গাড়িই বটে। আমরা তিনজনে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। শিখ গাড়ি চালাইয়া লইয়া চলিল।

রাতি হইয়াছিল। গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া বীরেনবাবু হঠাৎ বলিলেন, 'আপনার কয়েদীর খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। ইনি তিনিই বটে। মাস ছয়েক হল জেল থেকে বেরিয়েছেন।'

ব্যোমকেশ বলিল, 'খাক, তাহলে আর সন্দেহ নেই। মুখ পুড়োঁছিল কি করে?'

ইনি শিক্ষিত ভদ্রলোক আর বিজ্ঞানবিৎ বলে এংকে জেল-হাসপাতালের ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে দেওয়া হয়েছিল। বছর দুই আগে একটা নাইট্রিক অ্যাসিডের শিশি ভেঙে গিয়ে মুখের ওপর পড়ে। বাঁচার আশা ছিল না কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেলেন।'

আর কোনও কথা হইল না। মিনিট পনেরো পরে আমাদের গাড়ি এমন একটা পাড়ায় গিয়া দাঁড়াইল যে আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'ব্যোমকেশ, এ কি! এ যে আমাদের—' বহুদিনের পুরাতন কথা মনে পড়িয়া গেল। এই পাড়ারই একটা মেসে ব্যোমকেশের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল।*

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ, আমার অনেক আগেই বোঝা উচিত ছিল।' চালককে জিজ্ঞাসা করিল, 'এইখানেই তিনি গিয়েছিলেন?'

চালক বলিল, 'হ্যাঁ।'

একটু চিন্তা করিয়া ব্যোমকেশ বলিল, 'আচ্ছা, এবার আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চল।' বীরেনবাবু বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি, নামবেন না?'

'দরকার নেই। আমাদের শিকার কোথায় আছে আমি জানি।'

'তাহলে তাকে এখনি গ্রেপ্তার করা দরকার।'

ব্যোমকেশ বীরেনবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, 'শুধু গ্রেপ্তার করলেই হবে? দেশলায়ের বাস্কাটা চাই না?'

'না না—তা চাই বৈ কি। তাহলে কি করতে চান?'

'আগে দেশলায়ের বাস্কাটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর তাকে ধরতে চাই। চলুন, কি করতে হবে বাসায় গিয়ে বলব।'

আমরা আবার ফিরিয়া চলিলাম।

রাতি আটটার সময় আমি, ব্যোমকেশ ও বীরেনবাবু একটা অন্ধকার গলির মোড় এক ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে লুকাইয়া বসিলাম। এইখানে একটা গাড়ির স্ট্যান্ড আছে—তাই, আমাদের গাড়িটা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

সম্মুখে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে আমাদের সেই পুরাতন মেস। বাড়িখানা এ কয় বৎসরে কিছুমাত্র বদলায় নাই, যেমন ছিল তেমনই আছে। কেবল দ্বিতলের মেসটা উঠিয়া গিয়াছে; উপরের সারি সারি জানালাগুলিতে কোথাও আলো নাই।

মিনিট কুড়ি-পাঁচশ অপেক্ষা করিবার পর আমি বলিলাম, 'আমরা ধরনা দিচ্ছি, কিন্তু উনি যদি আজ রাত্রে না বেরোন?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বেরুবেন বৈ কি। রাত্রে আহাৰ করতে হবে তো।'

আরো কুড়ি মিনিট কাটিয়া গেল। ব্যোমকেশ গাড়ির খড়খড়ির ভিতর চক্ষু নিবন্ধ করিয়াছিল, সহসা চাপা গলায় বলিল, 'এইবার! বেরুচ্ছেন তিনি।'

*সত্যান্বেষণী' গল্প দুটো।

আমরাও খড়খড়িতে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, একজন লোক আপাদমস্তক রূপায় মূড়ি দিয়া সেই বাড়ির দরজা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তারপর একবার ক্ষিপ্ৰ-দৃষ্টিতে রাস্তার দুইদিকে তাকাইয়া দ্রুতপদে দূরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

রাস্তায় লোক চলাচল ছিল না বলিলেই হয়। সে অদৃশ্য হইয়া গেলে আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির সম্মুখীন হইলাম।

সম্মুখের দরজায় তালা বন্ধ। বোমকেশ মৃদু স্বরে বলিল, 'এদিকে এস।'

পাশের যে-দরজা দিয়া উপরে উঠবার সিঁড়ি আরম্ভ হইয়াছে, সে দরজাটা খোলা ছিল; আমরা তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এইখানে সরু একফালি বারান্দা, তাহাতে একাট দরজা নীচের ঘরগুলিকে উপরের সিঁড়ির সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। বোমকেশ পকেট হইতে একটা টর্চ বাহির করিয়া দরজাটা দেখিল; বহুকাল অব্যবহৃত থাকায় দরজা কীটদণ্ট ও কমজোর হইয়া পড়িয়াছে। বোমকেশ জোরে চাপ দিতেই হুড়ুকা ভাঙিয়া স্ফোরিত হইয়া গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম।

ভাঙা দরজা স্বাভাবিক রূপে ভেজাইয়া দিয়া বোমকেশ টর্চের আলো চারিদিকে ফিরাইল। ঘরটা দীর্ঘকাল অব্যবহৃত, মেঝের পুরু হইয়া ধূলা পড়িয়াছে, কোণে ঝুল ও মাকড়সার জাল। বোমকেশ বলিল, 'এটা নয়, ওদিকে চল।'

ঘরের একটা স্ফোরিত ভিতরের দিকে গিয়াছিল, সেটা দিয়া আমরা অন্য একটা ঘরে উপস্থিত হইলাম। এ ঘরটা আমাদের পরিচিত, বহুবার এখানে বাসিয়া আসিয়াছি। টর্চের আলোয় দেখিলাম ঘরটি সম্প্রতি পরিষ্কৃত হইয়াছে, একপাশে একাট তক্তপোষের উপর বিছানা পাতা, মধ্যস্থলে একাট টেবিল ও চেয়ার। বোমকেশ ঘরটার চারিপাশে আলো ফেলিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল, 'হুঁ, এই ঘরটা। বীরেনবাবু, এবার আসুন অন্ধকারে বসে গৃহস্বামীর প্রতীক্ষা করা যাক।'

বীরেনবাবু ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন, 'দেশলায়ের বাস্তুটা এই বেলা—'

'সেজন্যে ভাবনা নেই। রিভলবার আর হাতকড়া পকেটে আছে তো?'

'আছে।'

'বেশ। মনে রাখবেন, লোকেটি খুব শান্ত-শিষ্ট নয়।'

আমি এবং বীরেনবাবু তক্তপোষের উপর বসিলাম, বোমকেশ চেয়ারটা দখল করিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। আধঘণ্টা তখনও অতীত হয় নাই, বাহিরের দরজায় খুটু করিয়া শব্দ হইল। আমরা খাড়া হইয়া বসিলাম; নিশ্বাস আপনা হইতে বন্ধ হইয়া গেল।

অতি মৃদু পদক্ষেপ অন্ধকারে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তারপর সহসা ঘরের আলো দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

বোমকেশ সহজ স্বরে বলিল, 'আসতে আজ্ঞা হোক অনুকূলবাবু, আমরা আপনার পুরনো বন্ধু, তাই অনুমতি না নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছি। কিছু মনে করবেন না।'

অনুকূল ডাক্তার—অর্থাৎ দু'নম্বর বোমকেশবাবু—সুইচে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কিছুক্ষণ তিনি কথা কহিলেন না। তাহার পক্ষ্মহীন চক্ষু দু'টি একে একে আমাদের তিনজনকে পরিদর্শন করিল। তারপর তাহার বিবর্ণ বিকৃত মুখে একটা ভয়ঙ্কর হাসি দেখা দিল; তিনি দাঁতের ভিতর হইতে বলিলেন, 'বোমকেশবাবু, যে! সৎগে পুঁলিস দেখাচ্ছে। কি চাই? কোকেন?'

বোমকেশ মাথা নাড়িয়া হাসিল—'না না, অত দামী জিনিস চেয়ে আপনাকে বিপদগ্রস্ত করব না। আমরা অতি সামান্য জিনিস চাই—একটা দেশলায়ের বাস্তু।'

অনুকূলবাবুর অনাবৃত চক্ষু দু'টা বোমকেশের মুখের উপর স্থির হইয়া রহিল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'দেশলায়ের বাস্তু! তার মানে?'

'মানে, যে-বাস্তু থেকে একাট কাঠি সম্প্রতি টোমে যেতে যেতে আপনি আমার উপহার

দিয়েছিলেন, তার ব্যক্তি কাঠগড়াল আমার চাই। আপনি তাদের যে মূল্য ধার্য করেছেন অত টাকা তো আমি দিতে পারব না, তবে আশা আছে বন্ধুজ্ঞানে সেগুলা আপনি বিনামূল্যেই আমায় দেবেন।

‘আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না।’

‘পারছেন বৈকি। কিন্তু হাতটা আপনি সুইচ থেকে সরিয়ে নিন। ঘর হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেলে আমাদের চেয়ে আপনারই বিপদ হবে বেশী। আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করেননি, দু’টি রিভলবার আপনার বুকের দিকে স্থির লক্ষ্য করে আছে।’

অনুকূলবাবু সুইচ ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার মুখে পাশবিক ক্রোধ এতক্ষণে উল্লসিত ধরিত্রী দেখা দিল। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ‘(ছাপিবার যোগ্য নয়) আমার জীবনটা তুই নষ্ট করে দিয়েছিস! তো...’ অনুকূলবাবুর ঠোঁটের কোণে ফেনা গাঁজাইয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, ‘ডাক্তার, জেলখানায় থেকে তোমার ভাষাটা বড় ইয়ে হয়ে গেছে দেখছি। দেবে না তাহলে দেশলায়ের বাসুটা?’

‘না—দেব না। আমি জানি না কোথায় দেশলায়ের বাসু আছে। তোর সাধ্য হয় খুঁজে নে, —কোথাকার।’

নিশ্বাস ফেলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল—‘খুঁজেই নিই তাহলে।—বীরেনবাবু, আপনি সতর্ক থাকবেন।’

ব্যোমকেশ তরুপোষের শিয়রে গিয়া দাঁড়াইল। গেলাস-টাকা জলের কুঁজাটা সেখানে রাখা ছিল, সেটা দু’হাতে তুলিয়া লইয়া সে মেকের উপর আছাড় মারিল। কুঁজা শব্দে ভাঙিয়া গিয়া চারিদিকে জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া গেল।

কুঁজার ভগ্নাংশগুলির মধ্য হইতে নীল কাপড়ে মোড়া শিশির মত একটা জিনিস তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ আলোর সম্মুখে আসিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, ‘ওয়াটারপ্রুফ, শিশি, সীলমোহর, সব ঠিক আছে—শিশিটা ভাঙেনি দেখছি—বীরেনবাবু, দেখলাই পাওয়া গেছে—এবার চোরকে গ্রেপ্তার করতে পারেন।’

৬

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘এই কাহিনীর মরাল হচ্ছে—ভাগ্য ফলাত সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং। পুঁটিরাম যদি দাওয়ার বসে না থাকত এবং ট্যান্ডার নম্বরটা ৮০০৮ না হত, তাহলে আমরা অনুকূলবাবুকে পেতুম কোথায়?’

জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তা তো বুঝলুম, কিন্তু দেশলাই-চোর যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার কি করে হল?’

ব্যোমকেশ বলিল, ‘আমার সত্যান্বেষী জীবনে যতগুলা ভয়ংকর শত্রু তৈরী করেছি, তার মধ্যে কেবল তিনজন বেঁচে আছে। প্রথম—পেশোয়ারী আমীর খাঁ, যে মেয়ে-চুরির ব্যবসাকে সুক্ষ্ম লালিতকলায় পরিণত করেছিল। বিচারে পীনাল কোডের কয়েক ধারায় তার বারো বছর জেল হয়। দ্বিতীয়—পলিটিকাল দালাল কুঞ্জলাল সরকার, যে সরকারী অর্থনৈতিক গুপ্ত সংবাদ চুরি করে শেরার মার্কেটে বিক্রি করত। বছর দুই আগে তার সাত বছর স্ত্রীঘরের ব্যবস্থা হয়েছে। তৃতীয়—আমাদের অনুকূল ডাক্তার। ইনি কোকেনের ব্যবসা এবং আমাকে খুন করবার চেষ্টার অপরাধে দশ বছর জেলে যান। হিসেব করে দেখছি, বর্তমানে কেবল অনুকূলবাবুরই জেল থেকে বেরুবার সময় হয়েছে। সুতরাং অনুকূলবাবু ছাড়া আর কে হতে পারে?’

‘তা রটে। কিন্তু এই দম্ভানন ভদ্রলোকটিই যে অনুকূলবাবু এ সন্দেহ তোমার হয়েছিল?’

‘না। ঠাট্টার ভঙ্গীটা পরিচিত মনে হয়েছিল বটে কিন্তু ঠাট্টা সন্দেহ করিনি।’

তারপর সেই কোকনদ গদ্যের চিঠিখানা—সেটাও মনে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিল। কোকনদ নামটা এতই অস্বাভাবিক যে ছদ্মনাম বলে সন্দেহ হয়, উপরন্তু আবার 'গদ্য'। তুমি বোধহয় লক্ষ্য করেছ, আমাদের দেশের লোক ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হলেই নামের শেষে একটা 'গদ্য' বসিয়ে দেয়। তাই, দু'নম্বর বোমকেশবাবু যখন চিঠিখানা নিজের বলে স্পষ্টভাবে দাবী করতে না পেরেও নিয়ে চলে গেলেন, তখন আমার মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কোকনদ শব্দটা কোকনের কথাই মনে করিয়ে দেয়—তুমি ঠিক ধরেছিলে। কিন্তু তখন দু'নম্বর বোমকেশবাবুর ওপর কোনও সন্দেহ হয়নি, তাই মনের সংশয় জোর করে সরিয়ে দিয়েছিলুম। তারপর শ্রীরামপুর হাসপাতালে তুমি যখন বললে, উনি আমাকে দেখতে এসেছেন তখন নিমেষের মধ্যে সংশয়ের সব অন্ধকার কেটে গেল। বুকলুম উনিই অনুকূলবাবু এবং দেশলাই-চোর।

'উনি বোমকেশ নাম গ্রহণ করে এ বাসায় উঠেছিলেন কেন?'

'আগেই বলেছি প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি বড় অশুভ জিনিস। ঐ চিঠিখানা আমাকে দিয়ে, আমি বুঝতে পারি কি না দেখবার জন্যে উনি এত কাণ্ড করেছিলেন; আর ঐ প্রবৃত্তির ম্বারা তাড়িত হয়েই শ্রীরামপুরে আমার মৃত মুখ দেখতে গিয়েছিলেন। উনি জানতেন, গুঁর মুখের চেহারা এমন বদলে গেছে যে আমরা গুঁকে চিনতে পারব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, 'আচ্ছা, জলের কুঁজোর মধ্যে দেশলায়ের কাঠি লুকিয়ে রেখেছেন, এটা ধরলে কি করে?'

বোমকেশ কাঁহল, 'এইখানে অনুকূলবাবুর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশলায়ের কাঠি জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হবে এ কেউ কল্পনাই করতে পারে না। কাজেই, যদি কোনও কারণে তাঁর ঘর খানাতল্লাস হয়, জলের কুঁজোর মধ্যে কেউ তা খুঁজতে যাবে না। আমার সন্দেহ হল যখন শুনলুম, তিনি একটি হ্যান্ডব্যাগ আর জলের কুঁজো নিয়ে চলে গেছেন। হ্যান্ডব্যাগ না হয় বুকলুম, কিন্তু জলের কুঁজো নিয়ে গেলেন কেন? শীতকালে যে-লোক লেপ বিছানা নিয়ে গেল না, সে জলের কুঁজো নিয়ে যাবে কি জন্যে? জলের কুঁজো কি এতই দরকারী? তারপর তাঁর বাস্তু থেকে যখন গালা ওয়াটারপ্রুফ ইত্যাদি বেরুল, তখন আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না। কাঠিগুলি তিনি শিশিতে পুরে ওয়াটারপ্রুফ কাপড়ে জড়িয়ে সীলমোহর করে তাকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন, যাতে জলের মধ্যে থেকেও নষ্ট না হয়। অনুকূলবাবুর বুদ্ধি ছিল অসামান্য, কিন্তু বিপথগামী হয়ে সব নষ্ট হয়ে গেল!'

পুঁটিরাম চায়ের শূন্য বাটিগুলো সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বোমকেশ বলিল, 'পুঁটিরাম, ফাস্ট'বুক এনেছ?'

লজ্জিতভাবে পুঁটিরাম বলিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। অজিত, আজ থেকেই তাহলে পুঁটিরামের হায়ার এডুকেশন আরম্ভ হোক। কারণ প্রত্যেক বারই যে ৮০০৮ নম্বর ট্যাক্সিতে আসামী পালাবে এমন তো কোনো কথাই নেই।'